আমি যে আর সইতে পারিনে

– মোহাম্মদ আবদুল মাননান

প্রাককথন

পাঠক, ঋভু–ঋভু মিত্র এতটা আগে-ভাগে না গেলেও পারতো, কিন্তু নিজেতো আর যায়নি, যেতেও চায়নি, যেতে হয়েছে–সেখানে সবারই যেতে হয়, কিন্তু কেউই স্বেচ্ছায় যেতে চায় না; ঋভুর জন্য বেশ খানিকটা আগে ঘটেছে, এই-যা। ওর আর ফেরার নয়, আরও কিছুদিন থাকলে ভালো হতো, হয়তো খানিকটা পূর্ণতা পেতো–কারও জন্য দায় হতো না সে; এ-গল্পটাও লিখতে হতো না, এই তো; এতটুকুনই!

মধ্যভাগ

মিত্রপরিবারে এর আগেও ছোটখাটো দুর্ঘটনা কিংবা বিপদ-বিসংবাদ দেখা দেয়নি এমন নয়। দেবেন মিত্রের বাবা হরিপ্রসাদের মৃত্যুসময়ে ছোট বোনের বিয়ে বাকি, কেবল স্কুলে যায়, তিন ভাইয়ের ছোটটার লেখাপড়াও শেষ হয়নি, মেজাটা যদিও বাবার ব্যবসার দিকে খানিকটা ঝুঁকেছে তখন–তবে সুবিধে হচ্ছিলো না। মেজোবোন হঠাৎই বিধবা হয়ে গেলো। মায়ের একান্ত ইচ্ছায় বিধবা মেয়েকে সাতমাসের শিশুপুত্রসহ চট্টেশ্বরী রোডের মিত্রবাড়িতেই নিয়ে আসতে হয়েছিলো বছরটাক না পেরোতেই। সবটা দেবেন মিত্রকেই সামলাতে হয়েছে সে সময়ে। বাবা হরিপ্রসাদ মিত্রের স্বর্গীয় হওয়ার দু'বছরের মধ্যে বড় অংকের একটা মেয়াদি আমানত পরিপক্বতা পেয়েছিলো, মায়ের ইচ্ছেতে সেটি সবার মধ্যে ভাগ না করে বিধবা বোনের জন্য আলাদা ঘর উঠেছে মিত্রবাড়িতে। সে-টাকার আর্ধেকটার কিছু কম গচ্ছিত থাকবে ছোট মেয়ের জন্য–এটিও মায়ের ইচ্ছে। মা বলেন–তোদের স্বর্গীয় বাবা এ-টাকা মেয়েদের জন্যই রেখে গেছেন, আমাকে বলেছেন সে কথা; বড় জামাই এ টাকা নেবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সুধন্যাও জামাইয়ের মতো একই মত দিয়েছে, বলেছে–মেজোর জন্য বাড়ি হবে পৈত্রিকজমিতে, বাকিটা ছোটর বিয়ের জন্য তোলা থাকবে। সুতরাং পুরো টাকাটা মেজো মেয়ের জন্য চারঘরের একতলা দালান নির্মাণ আর ছোটটার বিয়ের জন্য খরচ হতে সমস্যা নেই। ভাইয়েরাও কেউ আপত্তি তোলেনি তখন। অবশ্য এখনকার ব্যাপার হলে কী হতো বলা একটু মুশকিলই–প্রায় অর্ধকোটি টাকার ব্যাপার! বড় মেয়ের জামাই শাশুড়িভক্ত, শাশুড়ির ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে যাবে না–একথা নতুন কিছু নয়। বড় জামাই রাজধানীতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, বিয়ের সময়ে যাতে কানাকড়িও নিতে না হয় সে ব্যাপারে একাট্টা ছিলেন তিনি। শ্বশুর হরিপ্রসাদ মিত্র অনেক কষ্টে জামাইয়ের কব্জিতে একটা ঘড়ি পরাতে পেরেছিলেন–সে অবশ্য অনেক আগের কথা; ইত্যবসরে কর্ণফুলি ব্রিজের নিচ দিয়ে কত জল গড়িয়ে সমুদ্রের অভিমুখে পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।। বড় ছেলে দেবেনের বিয়েতেও জামাইয়ের পণ না গ্রহণের কথা মনে রেখে একই আদর্শ ফলাতে চেষ্টা করেছেন, তখন আংশিক সফল হয়েছেন হরিপ্রসাদ মিত্র; পুরো ব্যর্থ হয়েছেন মেজো মেয়ের বিয়েতে।

মিত্রবাড়িটা বন্দর নগরীর একটা কেমন যেন ভিন্ন আকর্ষণ। যেন বাড়ির অধিক কিছু। হরিপ্রসাদের বাবা অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন বলে মিরসরাইয়ের গ্রামের অনেকে এখনও বলে। তিনি নিজে জীবনের পুরো সময় গ্রামে কাটালেও শহরে বিঘে তিনেক জায়গা কিনে রেখে গেছেন একমাত্র ছেলে হরির জন্য। হরিপ্রসাদও লেখাপড়ার দৌড়ে কমই দৌড়েছেন। কিন্তু বৈষয়িক ছিলেন। একটা ব্যবসা শুরু করেছিলেন বন্দর নগরীতে, ব্যবসার লক্ষ্মী তাকে বিমুখ করেনি। বাবাও ছেলেকে হরেক অনুকম্পা দিয়েছেন। মিরসরাইয়ের বাড়ি থেকে চাল-ডাল, সবজিই শুধু পাঠাননি, এখন যে-দ্বিতল ভবনটি; তাও হরিপ্রসাদের বাবাই করে রেখে গেছেন। ব্যবসার মূলধন; সেও বাবারই যোগান। কিন্তু নিজে একদিনের জন্যও শহরে থাকেননি। দ্বিতল বাড়ির সঙ্গে ছোট্ট একটা পুকুরও করেছেন–যা কিনা এই শহরে একেবারেই বিরল ব্যাপার; নিজহাতে লাগিয়েছেন হরেক রকমের ফলের গাছ, ফুলের গাছ। বাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় করেছেন একটা পূঁজোরঘর–জায়গাটা অপেক্ষাকৃত উঁচুতে, ঠিক টিলার মত; এতে পূজোস্থানটা একটা নান্দনিক রূপ পায়–পাশ ঘেঁষেই পুকুরটা।